আজকের কাগজ

তারিখ ... ২২।১০।৯১
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১

52

'বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন' প্রসঙ্গে

আজকের কাগজ, সোমবার, ১৪ আশ্বিন, ১৩৯৮ সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠায় হরিপদ ভট্টাচার্য মহোদয়ের "বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত প্রতিবেদনঃ কিছু কথা" শীর্ষক রচনার সূত্র ধরেই আমার এ লেখার অবতারণা। ভট্টাচার্য মহোদয় আমার শ্রদ্ধেয় এবং তাঁর তুলনায় আমি প্রায় অজ্ঞ। তবুও কিছু কথা না বলে পারছি না।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বর্তমানে প্রশংসাই ঘটনাবলীর চাইতে নিন্দাই ঘটনাবলীরই বেশি ছড়াছড়ি- সে কথা কোনো দলিলপত্র দিয়ে প্রমাণ কতে হবে না আশা করি। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথারীতি ক্লাশ হবে, ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো পাস করবে, এম.ফিল, পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করবে এবং তারপর সবাই নিজ নিজ পছন্দ মতো কর্মে আত্মনিয়োগ করবে- এটাই স্বাভাবিক এবং সমগ্র জাতির প্রত্যাশা। এর ব্যতিক্রম ঘটলে এবং সেই ব্যতিক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে সেক্ষেত্রে অভিভাবকরাসহ সমগ্র জাতি উদ্বিগ্ন হবেই এবং তা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রতিফলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিতও। শিক্ষাঙ্গনের ঘটন-অঘটন-দুর্ঘটন সমূহ এবং জাতির প্রত্যাশার হন্তারক অপশক্তিসমূহ সম্পর্কে জাতিকে যথাযথ অবগত করা পত্রিকাসমূহের দায়িত্বও বটে। যে কোনো ঘটনা যথা-নিয়মে ঘটতে থাকলে তা নিয়ে মানুষের খুব একটা মাথাব্যাথা থাকে না, নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে সেখানেই কৌতূহল, বক্তৃতা, বিবৃতি, সম্ভাব্য কারণ, প্রতিকারের উপায় ইত্যাদি সার-অসার কার্যের ধুম পড়ে যায়। যেমন- এদেশে প্রতিদিন হাজার হাজার শিশু স্বাভাবিক আকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে, তার খবর ক'জন রাখে? কিন্তু কোথাও কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক শিশু দুই মাথা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলে সে খবর পত্রিকার পাতায় ঠিকই স্থান করে নেয়।

বিশ্ববিদালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ অবশ্যই আছে। যেখানে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি অভিযোগ বিদ্যমান, সেখানে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত নাও হতে পারেন। সমমতাদর্শসম্পন্ন ছাত্রদের নিয়ে গ্রুপিং এবং সন্ত্রাসে উৎসাহ প্রদান নিশ্চয়ই কোনো যোগ্য শিক্ষকের কার্যক্রমের আওতায় পড়ে না। ছাত্র-শিক্ষকের রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফলের ওপর প্রভাব বিস্তার করার ঘটনাও বিরল নয়। এ সকল কারণেই ছাত্র কর্তৃক শিক্ষক লাঞ্ছিত এবং ভট্টাচার্য মহোদয়ের ভাষায় 'জীবননাশের ঘোষণাপ্রাপ্ত' হয়। সার্বিক সামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয় এ ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে।

একজন ছাত্র যখন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে অবস্থান করে, তার নিরাপত্তা বিধান করা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশংসিত হবার মতো কোনো ভূমিকা কোনো ইউনিভার্সিটি পালন করতে পারছে কি? মহোদয়, এই দায়ভার কিছুটা কি আপনার ওপরও বর্তায় না? আর সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার খবর পত্রিকার পাতায় ছাপা হলে ক্ষুব্ধ না হয়ে সংশোধিত হওয়াই কি প্রত্যাশিত নয়? আমাদের অভিভাবকদেরকে কেন প্রায় আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়- না জানি কখন তাঁদের সোনার ছেলে লাশ হয়ে ঘরে ফেরে? একজন ছাত্রকে সন্ত্রাসী বানায় অভিভাবক নয়, বিশ্ববিদ্যালয়। এইচএসসি-তে ভালো ফলাফল করা সুসন্তান বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে পা রেখেই বারুদের নেশায় মাতাল হয়ে পড়ে, তার জন্যে দায়ী অভিভাবকরা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের যুদ্ধংদেহী পরিবেশ। আর সে পরিবেশের সযত্ন লালন এবং বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের ভূমিকাই সর্বাগ্রে কাজ করে। যথাসময়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন পরিসমাপ্তির নিশ্চয়তা বাংলাদেশের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও দিতে পারে কি? চাকরির সময়সীমা ৩০ বছর পুনঃনির্ধারিত হয়েছে বটে, কিন্তু বিরাজমান পরিস্থিতিদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় ৪০ বছরেও শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া মানে তার ইহজাগতিক যাবতীয় কামনা-বাসনা অবরুদ্ধ সময়ের কাছে বন্ধক রাখা।

আমার একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক একবার বলেছিলেন, "আমার সন্তানের হাতেখড়ি 'অ' 'আ' দিয়ে নয়, বন্দুকের ট্রিগার দিয়ে দেব।" সার্বক্ষণিক সন্ত্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ের আঘোষিত সিলেবাসে পরিণত হওয়ার কারণেই তাঁর এই খেদোক্তি। ভট্টাচার্য মহোদয়, কুকীর্তির মেলায় সুকীর্তি মাথা বের করবার শক্তি পাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান যথাযথ স্বীকৃতি পাচ্ছে না- এ অভিযোগও সঠিক নয়, ইতিহাস খুললেই প্রমাণ মিলবে। এ মুহূর্তে দরকার পরিশোধিত প্রত্যাশিত বিশ্ববিদ্যালয়াঙ্গন গড়ে তোলা, যার জন্যে জাতীয় ঐকমত্যের প্রয়োজন, আর সে ঐকমত্য গড়ে তোলার দায়িত্ব প্রধানতঃ প্রচার মাধ্যমসমূহেরই।

কে. এইচ. সিরাজী
চিকিৎসক, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।